বাঙলার গ্রাম্য ছড়া
সাগর বিশ্বাস

বাঙলাদেশের 'ছেলে ভুলানো' ছড়ার বিচিত্রসৌন্দর্য একদা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকেও মুগ্ধ করেছিল। তিনি নিজেই লিখেছেন-'বাংলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে সকল মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মূল্যথা কিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছেসেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।''

শুধু রবীন্দ্রনাথই নন, বাঙলার ও বাঙালির একান্ত নিজস্বযে বিরাট পল্লি সাহিত্য, পৃথিবীর বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিই তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছেন। বিশ্ববিখ্যাত ফরাসি সাহিত্যিক রোমা রোঁলা তোময়মনসিংহ গীতিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছেন। তবুও একথা সত্য যেবাঙলার সুপ্রাচীন গ্রাম্যসাহিত্য আজ বহুলাংশেই বিস্মৃত প্রায়।সেই কবিগান, পালা গান, পাঁচালি, জারি, আখড়াই, ভাটিয়ালি, অষ্টক, বান্ধটি আজ আর শোনা যায় না, শোনা যায় না বাঙলার অজস্র রূপকথা। এখনকারছোট ছেলেমেয়েরা আর 'রোদ হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে, খেঁকশিয়ালের বিয়ে হচ্ছে', বলে হাততালি দিয়ে নেচে ওঠে না। তারা বলে 'Twinkle twinkle little star'কিংবা ''Ba Ba Black sheep have you any wool? ''তারা আর কাঞ্চনমালার গল্প শোনে না, তারা শোনে Cinderella-র কথা, King Midas আর Selfish Giant এর কথা, Fairy Tales কিংবা Arabian Nights এর কথা। তাদেরমা-বাবারা ভুলে গেছে কাঞ্চনমালার গল্প-ভুলে গেছে সেই দ্বিস্রোতা(রক্ত স্রোত আর দুগ্ধস্রোত) নদীকে - ভুলেছে সেই সুখী শুক-শারীকিংবা ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী দম্পতিকে। এদেশে রাজনৈতিক নেতাদের স্মৃতি রক্ষাকল্পে কত সমিতি গড়ে ওঠে, তাদের কুড়োনো পুতুলের সম্ভারে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সংগ্রহ শালাও ভরে ওঠে, কিন্তু এই বিরাট জীবনধর্মী সাহিত্যকে রক্ষা করতে কোনও কার্যকরী সমিতি গড়ে ওঠে না। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সভ্যতার বেনোজলে বাঙলার 'বিশাল'প্রোলেতারিয়েত সাহিত্য আজ বিলুপ্তির পথে। তাই একদা বিখ্যাত ভাষা ওসাহিত্য গবেষক ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ দুঃখ করে বলেছিলেন''আজকাল বাংলা সাহিত্য বলে যে সাহিত্য চলছে তা আসলে শহুরে সাহিত্য,সাধু ভাষায় বলতে গেলে নাগরিক সাহিত্য। যে সাহিত্যে আছে রাজারা জড়ার কথা,বাবু-বিবির কথা, মটরগাড়ির কথা, বিজলি বাতির কথা, সিনেমা থিয়েটারের কথা, চায়ের বাটিতে ফুঁ দিবার কথা।... পল্লীর গৃহস্থ কৃষকের,জেলে-মালির, মুটে-মজুরের কোন কথা তাতে ঠাঁই পায় না। আমাদের আজ দরকার হয়েছে শহুরে সাহিত্যের বালাখানার পাশে গেঁয়ো সাহিত্যের জোড়বাংলা ঘর তুলতে। আজ অনেকের আত্মা ইঁট পাথর ও লোহার কৃত্রিম বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে মাটির ঘরে মাটির মানুষ হয়ে থাকতে চাচ্ছে। কিন্তু কোথায় সে পল্লীর কবি, ঔপন্যাসিক ও সাহিত্যিক যাঁরা নিখুঁত ভাবে এই পল্লীর ছবিশহরের চশমা-আঁটা চোখের সামনে ধরতে পারবেন?'' ডঃ শহীদুল্লাহ অবশ্য যেদিন উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন সেদিন থেকে বাঙলার নবীন সাহিত্য অনেকটা পথ অতিক্রম করে এসেছে। এই দীর্ঘ পরিত্র মার মধ্যে সাহিত্যের আঙ্গিক ওবিষয় বস্তুরও অনেক রূপান্তর ঘটেছে। আজকের বাঙলা সাহিত্যেপ্রোলেতারিয়েত সমাজের স্থান সীমিত হতে পারে, কিন্তু একেবারেনেই একথা বোধহয় আর বলা যায় না। তবু যে তা আশানুরূপ নয় একথা মনেরাখা দরকার। বর্তমান নিবন্ধেপল্লি সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখার কথাই আলোচ্য বস্তু। তাই তার ব্যাপক আলোচনা অকারণ না হলেও অপ্রয়োজনীয়। এখানে যে ছড়াগুলি সংকলিত হয়েছে সেগুলি পূর্ব-বাঙলা অধূনা বাঙলাদেশেব গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহিত। যতদূর জানি ইতিপূর্বে এগুলি প্রকাশিত হয়নি। তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লোক সাহিত্য' গ্রন্থে দেখিয়েছেন কীভাবে বঙ্গপল্লির একই ছড়া শব্দান্তরের ফলে বিভিন্ন রূপ লাভ করে। সেদিক থেকে এর কিছু কিছু ছড়ার সঙ্গে কোথাও কোথাও প্রকাশিত ছড়ার সাদৃশ্য থাকা সম্ভব।

লোক সাহিত্যের ছড়াগুলিকে রবীন্দ্রনাথ 'শিশু সাহিত্য' বলে উল্লেখ করে বলেছেন 'তাহারা মানব মনে আপনি জন্মিয়োছে।' কবির কথায়-''আমাদের মনের মধ্যে বিশ্বজগতের প্রতিবিম্ব এবং প্রতিধবনি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভাবে ঘুরিয়া

বেড়ায়। তাহারা বিচিত্র রূপ ধারণ করে এবং অকস্মাৎ প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে গিয়া উপনীত হয়।...সহজ অবস্থায় আমাদের মানসাকাশে স্বপ্নের মতো যে সকল ছায়া এবংশব্দ যেন কোন্ অলক্ষ্য বায়ুপ্রবাহে দৈব চালিত হইয়া কখনো সংলগ্ন কখনো বিচ্ছিন্ন ভাবে বিচিত্র আকার ও বর্ণ পরিবর্তন পূর্বক ক্রমাগত মেঘ রচনা করিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা যদি কোনো অচেতন পটের উপর নিজেরপ্রতিবিম্ব প্রবাহ চিহ্নিত করিয়া যাইতে পারিত তবে তাহারসহিত আমাদের আলোচ্য এই ছড়াগুলির অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাইতাম। এই ছড়াগুলি আমাদের নিয়ত পরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়ামাত্র, তরলস্বচ্ছ সরোবরের উপর মেঘক্রীড়িত নভোমণ্ডলের ছায়ার মতো। সেই জন্যই বলিয়াছিলাম ইহারা আপনি জন্মিয়াছে।'' কবির ব্যাখ্যা যেমনইহোক, এই গ্রাম্য ছড়াকে শিশু সাহিত্য বলে ধরে নিতে বাধা নেই এই কারণে যে অধিকাংশ ছড়ার মধ্যেই শিশুমনের অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে। কখনও কখনও এদের কোনওটি যে শিশুদের মন থেকে রচিত হয়েছে এ বিশ্বাস করতেও বাধা নেই(যেমন-'রোদ হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে, খেঁকশিয়ালের বিয়ে হচ্ছে' ইত্যাদি ধরণের ছড়াগুলি)। তবে শিশুদের হাতেই হোক আর বয়স্কদের হাতেই হোক--শিশু মনের চিরন্তন খেয়ালি চপল অভিব্যক্তিরবৈশিষ্ট্যেই যে এরা চিরত্ব লাভ করেছে এতে কোনও সন্দেহ নেই। বাস্তবিকই এরা 'আমাদের নিয়ত পরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়ামাত্র।' তথাপি এই গ্রাম্য ছড়াগুলির মধ্যে এমন ছড়াও আছে,যেগুলির মধ্যে শিশুমন নয়-- পরিণত মনেরই অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ নীচের ছড়াটির কথা ধরা যাকঃ

আতার গাছে তোতার বাসা
ডালিম গাছে মৌ
পান খেয়ে যাও রসের বন্ধু
চিকন কাটা গুয়ো।
সিথেনে থুই পানের বাটা
কপালে দিই চুনের ফোঁটা
ঘরের দুয়োরে ফুলগাছ লাগাই
পাতাটি তার চিকন।
ডাল ভাঙিতাম ফুল তুলিতাম
সেইতো ছিলভালো
রাখাল আমায় পিঠ দেখায়ে
কাঁদতে জনম দিল।
রাখাল তুমিগ রাখো
কাজল নদীর বাঁকে
ও রাখাল একবার ফিরে চাও
আমার মুখের দিকে।
জল ঢেলে জল আনতে গেলাম
কদম তলার ঘাটে,
মুখ ঢুলায়ে কথা কলাম
নন্দ জামাইর সাথে।

ছন্দ বিশ্লেষণ করলে হয়তো এর মধ্যে ত্রুটি পাওয়া যাবে। কিন্তু নারী হৃদয়ের যে সহজ স্বাভাবিক অনুভবের কথা এর মধ্যেব্যক্ত হয়েছেসেটুকুই সম্পদ। বাঙলার সমাজে দুটি পৌরাণিক কাহিনির প্রভাবঅপরিসীম। তার একটি হল হরগৌরীর কাহিনি, অপরটি রাধাকৃষ্ণের। হরগৌরীর কাহিনিতে যেমন বাঙালি গৃহস্থের অন্তঃপুরের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে, রাধাকৃষ্ণের কাহিনিতে তেমনি মানব মানবীর হৃদয়-অন্তঃপুরের সহজিয়া ধর্মের কথা ব্যক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় রাধাকৃষ্ণর কাহিনি বাঙালির 'ভাবের কথা'। আমাদের উপরোক্ত গ্রাম্য ছড়াটির মধ্যে রাধাকৃষ্ণের সেই সহজিয়াপ্রেম-বিরহের প্রভাব পড়েছে। পরিণত নারী হৃদয়ের বিরহের করুণ আর্তি ধবনিত হয়ে

ভাবের দিক থেকে ছড়াটি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। এই প্রাণের বেদনা ও আর্তি ছাড়াও দৈনন্দিন গার্হস্থ্য-জীবনে বেঁচে থাকবার জন্যও যে অনেক স্বাভাবিক অভাবজনিত আর্তি থাকে, কোনও কোনও ছড়ার মধ্যে তারও প্রতিফলন দেখা যায়। যেমনঃ

বুচি গেছে নাক ফুটোতে
কলইডাঙার মাঠে,
সেই খবর শুনে আসি
জামতলার হাটে।
জাম পাকিছে থলি থলি
কাওই খুঁচে খায়,
আষাঢ় মাসে খাজনা দিতি
পরান ফাটি যায়।

আষাঢ় মাস বাঙলার গ্রাম্য কৃষকের এবং মেহনতি মজুরের নিকট খুবই কষ্টকর সময়। বলা যেতে পারে আশাঢ়েড় আউশের ফসল তখনও মাঠ থেকে ঘরে ওঠেনি- হয়ত উঠি উঠি করছে। সারা বছরের পরিশ্রমের ফসলের দিকে তাকিয়ে কৃষক এবং কৃষকবধূ তখন নীরবে প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে। সেই সময় জমিদার বাসরকারের খাজনা দেওয়া যে একটি প্রাণান্তকর ব্যাপার হবে এতে আর সন্দেহ কী। তাই শ্রীমতি বুচির নাক ফোটানো কিংবা থলি থলি পাকা জামের উপর বায়স-কুলের আক্রমণের খবর ছাপিয়ে যে কথাটি বড় হয়ে ওঠে তা হল 'আষাঢ় মাসে খাজনা দিতি পরান ফাটি যায়।' মাঠের ফসলের দিকে তাকিয়ে যখন জলের অপ্রাচুর্য চোখে পড়েছে কিংবা অনাবৃষ্টির আকাশথেকে যখন সূর্য গলে গলে পড়ছে তখন ঃ

কলা বাগানে গলা জল
ধান বুনিছি হাঁটু জল।
ও লো মেঘারানি,
শাক ধুয়ে ফেলা পানি।
শাকে বড় গন্ধ
ভুঁইতে বড় খন্দ।
কালা মেঘ ধলা মেঘ
তোমরা দুটি ভাই,
আমাদের একটু জল দাও
ধানের ভাত খাই।

'পানি' বাঙলা শব্দ নয়। তবু বাঙলা ভাষায় এর ব্যবহার সেই তুর্কি আক্রমণের পর থেকে। এমন বহু বিদেশি শব্দ বাঙলা শব্দ ভাণ্ডারে স্থান করে নিয়েছে। 'পানি' শব্দটি অবশ্য যতটা বাঙলার মুসলমান সমাজে প্রচলিত, হিন্দু সমাজে ততটা নয়। তথাপি বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক আদান প্রদান ও সৌভ্রাতৃত্বের ফলে বাঙলার পল্লি সাহিত্যে ভাষা ও সংস্কৃতির যে একটি সুন্দর সংমিশ্রণ চোখে পড়ে তা নিঃসন্দেহে গর্বের। মৌলবাদীরা এ কথায় নাসিকা কুঞ্চন করতে পারেন। কিন্তু বাঙলার জারি, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, গাজির গান এবং বাউল সংগীত এ কথার যাথার্থ প্রতিপন্ন করবে। যাঁরা নাসিকা কুঞ্চন করেন তাঁরা ভুলে যান যে ওই পারস্পরিক আদান-প্রদান ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিন্ন করার চেষ্টা হয়েছিল কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিভেদপন্থী কর্তৃক। পরবর্তীকালে সেই বিভেদ পন্থীরাই নজরুলের কাব্য থেকে 'ভগবান' কেটে 'রহমান' করেছে, রবীন্দ্রনাথকে বানিয়েছে'হিন্দু কবি।' অথচ

ডঃ শহীদুল্লাহ্ লিখছেন, ‘‘এই সমস্ত রূপ কথা, পল্লীগাথা, ছড়া প্রভৃতি দেশের আলো জল বাতাসের মত সকলেরই সম্পত্তি, তাতে হিন্দু-মুসলমান কোন ভেদ নাই। যেমন মাতৃস্তনে সন্তান মাত্রেরই অধিকার সেইরূপ এই পল্লী সাহিত্যে পল্লী জননীর হিন্দু-মুসলমান সকল সন্তানেরিই সমান অধিকার।’’ যা হোক, আমরা আমাদের ছড়ার কথায় ফিরে আসিঃ

মুঠ করে মুঠ করে
ঘসি ভেঙে দে,
বড় গাঙের খাল ছুটেছে
পালকি এনে দে।
পালকির মধ্যে পাকা পান
বর আইছে মোছলমান,
বরের মাথায় টাক টুক
কনের মাথায় টাকা,
ধুত্তোরি তোর মোচ-দাড়িটা পাকা।
এ ছড়াটির মধ্যে তেমন কোনও অসঙ্গতি নেই। কিন্তু এবার যে ছড়াটির উল্লেখ করতে যাচ্ছি, তার মধ্যে একটা মজার অসঙ্গতি দেখা যাবে। কিন্তু ছড়ার বাক্যে এ ধরনের অসঙ্গতির উপর প্রশ্ন তোলা চলে না।ছড়া হচ্ছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেইনিরক্ষর পল্লিরমণীর আসর জমানো অথবাছেলে ভুলানোর চিত্রময় কল্পনা কবিতা। অনেক ক্ষেত্রে রূপকথার সৌন্দর্যলাভ করলেও জীবন থেকে এদের আলাদা করা চলে না।

হাড়গুড়েরে ভাই
চিঁড়ে কুটে খাই
একটা চিঁড়ে কম পড়লে
মামার বাড়ি যাই।
মামার আছে নীলঘোড়া
আমার আছে গাই
দুই ভাইতে দাবড় ছেড়ে
লক্ষ্মীবাসা যাই।
লক্ষ্মী দিলেন ধানদুব্বো
কালী দিলেন ফুল
যমুনারে বিয়ে দিলাম
সাত গাঙের কুল।
ও যমুনা ওঠেক রে
সাতটা বাগুন কোটেক রে,
জামাইর পাতে ভাত দে,
সরা ভরে দুধ দে।
জামাই গেল হাসতি হাসতি
যমুনা গেল নাচতি নাচতি।

যশোর জেলার নড়াইল মহকুমার লোহাগড়া থানায় লক্ষ্মী পাশা নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে একটি কালীমন্দির আছে। জেলারমধ্যে লক্ষ্মী পাশা এই কালী মন্দিরের জন্যই বিখ্যাত। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষেরা প্রগাঢ় বিশ্বাসে এখানে পুজো দিতে আসে। প্রতিবছর। গ্রামের নাম লক্ষ্মীপ াশা কেন হল সে তথ্য আমার জানা নেই। যে জন্যই হোক,

গ্রাম্য মানুষের উচ্চারণে সেটা 'লক্ষ্মীবাসা' হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানের নাম যখন'লক্ষ্মীবাসা' তখন লক্ষ্মী যে সেখানে সত্যি বাসা বেঁধে আছেন গ্রাম্য মানুষের এই ধারণা যেন ছড়ার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেননা ছড়ার চয়িতা দেবী লক্ষ্মীর নিকট থেকে ধানদুব্বো লাভ করেছেন একথা পরিষ্কার বলা হয়েছে। অথচ সেটা কালী মন্দির, লক্ষ্মীর থাকার কথা নয়।'লক্ষ্মীবাসা' থেকেই লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান কল্পিত হয়েছে। আগেই বলেছি, ছড়ার রাজ্যে যুক্তি তর্কের স্থান নেই। যে অসঙ্গতিটার কথা বলছিলাম তা হল রচয়িতার ঘরে চিঁড়ের অভাব হলে তিনি মামাবাড়ি যান এটা বোঝা গেল; মামা বাড়িতে মামার একটি নীলরঙের ঘোড়া আছে (এবং রচয়িতার একটি গাই) তাও বোঝা গেল। কিন্তু এই ঘোড়া এবং গো চেপে 'লক্ষ্মীবাসা' যাত্রার প্রাক্কালে উভয়ের সম্পর্কটি মামা-ভাগনে (অথবা ভাগ্নী) না হয়ে ভাই-ভাই হল কী করে এটা বোঝা গেল না। উপরন্তু শ্রীমতী যমুনাদেবীর অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের প্রশ্নটিও উপেক্ষা করা চলেনা। লক্ষ্মীপাশা কালীমন্দিরের জন্য বিখ্যাত হলেও শুক্ত গাঁ যে ঢাকিদের জন্য মোটেই খ্যাতিলাভ করতে পারেনি-একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আর একটি ছড়ায় ঃ

ছোট্ট কালে খেলাই ছিলাম
ছোট্ট কুলো নিয়ে
ভাই-বউতে গালইছিল
থুবড়ি থুবড়ি বলে।
আজ থুবড়ির অধিবাস
কাল থুবড়ির বিয়ে
থুবড়িরে নিয়ে গেল
ঢাকের বাড়ি দিয়ে।
কনার ঢাক কনার ঢাক
শুত্ত গাঁয়ের ঢাক
কুয়োর কুলে ড্যাব ড্যাবাচ্ছে
ঢ্যামনা বাজনদার।

রবীন্দ্রনাথের লোক সাহিত্যে সংগৃহিত ৬৩ নং ছড়ার দুটিলাইনের সঙ্গে ছড়াটির প্রথম দিকের বেশ মিল আছে। রবীন্দ্রনাথের সংগৃহিত ছড়াটির লাইন দুটি তুলে দিচ্ছিঃ

ছোট বেলায় খেলাই ছিলাম ঘুটি মুছি দিয়া
মা গালাই ছিলেন খুবরি বলিয়া।

পার্থক্য শুধু ছোট্ট কুলোর সঙ্গে ঘুটি মুছির, মা-র সঙ্গে ভাই-বউয়ের এবং খুবরির সঙ্গে থুবড়ির। তা নইলে বক্তব্য একই। এরকম সাদৃশ্য আরও আছে ঃ

বেনুরে বিয়ে দিলাম
হলদে ডাঙার মাঠে
তারা শানে কাপড় কাচে।
ইষ্টি কুটুম দেখলে তারা
মুখ ফিরায়ে নাচে।

লোক সাহিত্যের ৭৭ নং ছড়ার সঙ্গে এ ছড়াটির শব্দগত সাদৃশ্য তেমন নেই। তবু ভাবগত সাদৃশ্য যথেষ্ট। এবারে যে

ছড়াটির উল্লেখ করব তাতে লোক সাহিত্যের ৩১ এবং ৩৯ নং ছড়ার ভাবগত সাদৃশ্যও যেন অনেক কমেগেছে।

হলদি কোটো মরিচ কোটো
জোড় পুতুলের বিয়ে,
ওই আসতিছে নতুন জামাই
গামছা মুড়ি দিয়ে।
ও গামছা ভালো না
মেয়ের বিয়ে দেব না
কাঁচা মেয়ে দুধের সর
ক্যামনে করবে পরের ঘর?
পরে কত বলবে
ফুলে ফুলে কাঁদবে।

তবে সাদৃশ্য থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথের মতে-''একই ছড়ার অনেক পাঠও পাওয়া যায়; তাহার মধ্যে কোনটি বর্জনীয় নহে। কারণ ছড়ায় বিশুদ্ধ পাঠ বা আদিম পাঠ বলিয়া কিছুনির্ণয় করিবার উপায় বা প্রয়োজন নাই। কালে কালে মুখে মুখে এই ছড়াগুলি জড়িত মিশ্রিত এবং পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে যে ভিন্ন ভিন্ন পাঠের মধ্য হইতে কোন একটি বিশেষ পাঠ নির্বাচিত করিয়া লওয়া সম্ভব হয়না। কারণ, এই কামচারিতা কামরূপধাবিতা ছড়াগুলির প্রকৃতিগত। ইহা অতীত কীর্তির ন্যায় মৃতভাবে রক্ষিত নহে। ইহারা সচল, ইহারা দেশ কালপাত্র বিশেষে প্রতিক্ষণে আপনাকে অবস্থান উপযোগি করিয়া তুলিতেছে। ছড়ার সেই নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রকৃতিটিদেখাইতে গেলে তাহার ভিন্ন ভিন্ন পাঠ রক্ষা করা আবশ্যক''। এদিক থেকে বিবেচনা করেই সামান্য সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি ছড়ার উল্লেখ করেছি। গ্রাম্যছড়া যে চিত্রধর্মী একথা অনস্বীকার্য। এই চিত্রধর্মীতা যে কতদ্রুত পরিবর্তিত হতে পারে তারই একটি দৃষ্টান্ত এবারের ছড়াটি ঃ

একটা ঘুঘু পেলামরে
তেল দে ভেজে খেলাম রে,
আর একটা ঘুঘু পেলাম রে
ধনার জন্যে থুলাম রে।
ধনা গেছে হাটে
বেল পড়েছে মাঠে।
সদ্দার বাড়ি চিড়ে কোটে
ঢেকুর ঢেকুর ফার পড়ে।
ও পথে ভাই যেয়ো না
খ্যাঁকশেয়ালের ভয়,
এক ব্যাটা মরে আছে
তার নাকদে' কথা কয়।

একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে স্বল্পায়তন এই ছড়াটির চিত্র ধর্মীতা কত দ্রুত স্থান থেকে স্থানান্তরে উপনীত হয়েছে। একটা ঘুঘু পাওয়া, তাকে তেলে ভেজে খাওয়া এবং আর একটি ঘুঘুপেয়ে সেটা ধনার জন্যে রেখে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এসে গেছে ধনার হাটে যাবার কথা। ধনার হাটে যাবার সঙ্গে কোনও সঙ্গতি না রেখেই মাঠের মধ্যে বেল পড়ল। মুহুর্তে সর্দার বাড়িতে চিঁড়ে কোটার চিত্র এসে গেল। আর তার পরেই একটি বিশেষ পথে যাবার নিষেধাজ্ঞার

সঙ্গে সঙ্গে সেই পথের মধ্যে এক মৃত ব্যক্তির চিত্র চোখের সামনে তুলে ধরা হল। চলচ্চিত্রের ছবির মতো সারবেঁধে এই চিত্রগুলি পাঠকের মনের দুয়ারে এসে দাঁড়ায়। গ্রাম্য ছড়াগুলির মধ্যেমাঝে মাঝে দুই-একটি এমন অশ্লীল শব্দের ব্যবহার ঘটে যা গ্রাম্য মজলিশে বেমানান নাহলেও ছাপার অক্ষরে উপস্থিত করা চলে না। তখন তার অনাবৃত আদিম শরীরে আধুনিক মিলের তৈরি চেলি পরানোর প্রশ্ন এড়ানো যায় না। এতে তার স্বাধীন ঋজু পদক্ষেপ কুণ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু তার সলজ্জ মেয়েলি ছাঁদটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই কারণেই গ্রাম্য ভাষার ক্ষতাকে পরিমার্জিত করতে গিয়ে হয়তো কদাপি শব্দেরও পরিবর্তন ঘটাতে হয়। উপরোক্ত ছড়াটির সর্বশেষ পংক্তিতে তাই হয়েছে। মৃত মানুষকথা বলতে পারেনা একথা সত্য। তবুও ছড়া রচয়িতা পথের মধ্যে সেই মরা মানুষের কথা শুনতে পান। আর সে কথা বাগ্‌যন্ত্রের মাধ্যমে উৎসারিত না হয়েএমন একটি স্থান থেকে শোনা গেল যা লিখিত সাহিত্যে প্রকাশ করাকঠিন। গার্হস্থ জীবনে কেবল মাত্র নরনারীর বিবাহকে কেন্দ্র করেই বাঙলাদেশে বিস্তর ছড়া রচিত হয়। এ প্রসঙ্গে এবার একটি ছড়ার উল্লেখ করব যার অংশ বিশেষ উত্তর চবিবশ পরগণা ও নদীয়া জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলেও শুনতে পেয়েছি। আমার বিশ্বাস, এ সকল ছড়ার প্রচলনক্ষেত্র আরও ব্যাপক। একালে বাঙলাদেশের মানুষ ছড়া রচনাকরে না। সেই অন্তঃপুরের প্রাণ চাঞ্চল্য আজ আর নেই। নেই সেইশান-বাঁধানো পুকুরের সাধারণ ঘাট, যেখানে প্রতি সায়াহে জনপদ বধূ সম্মেলনের মাধ্যমে পারস্পরিক আদান প্রদান-ভাববিনিময় অব্যাহত ছিল।এখন বাঙালির অন্তর ও বাইরের জগতে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তীব্র যুগযন্ত্রণা এবং বেঁচে থাকার নির্মম প্রতিযোগিতা তাকে অনেক কিছু ভুলিয়ে দিয়েছে। সে আজ প্রতিবেশীর সাথেও যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছে। তবু একদা সায়াহে বাঙলার পল্লি রমণীর কণ্ঠে কণ্ঠে যে কবিতা ঝঙ্কৃত হয়ে উঠত একটু সচেতন কান পেতে দিলে তা আজও কিছু কিছু শোনা যায় বই কী।

পালং পাতা পালং পাতা
তোমার নাকি বিয়ে
হাওড়া থেকে বর আসবে
টোপর মাথায় দিয়ে।
বর দেখে যাও বর দেখে যাও
রান্না ঘরের ঝুল
মেয়ে দেখে যাও মেয়ে দেখে যাও
কনক চাঁপা ফুল।
বুড়ো ধাড়ি মেয়ে আবার কাঁদতে বসছে।
মুখপোড়া জামাই আবার তেড়ি কেটেছে।

বঙ্গভঙ্গ তথা দেশ বিভাগের পরে হাওড়া পূর্বাঞ্চলের মানুষের নিকট থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে। তবু হাওড়াকে ওরা ভুলেযায়নি। ছড়া থেকে বিদায় করেনি। একবারও পুনর্বিবেচনা করতে চায়নি যে,হাওড়া থেকে আজ আর সহজে বর আসতে পারে না। সে সকাল বিকেলের হাওড়া আরনেই। সে এখন আন্তর্জাতিক সীমারেখার দৌলতে আন্তর্জিতিক হাওড়ায় পরিণত হয়েছে। তাই বাইরের দিক থেকে হাওড়া দূরবর্তী হলেও মনের দিক থেকে তার স্থান আগেও যেখানে ছিল আজও সেখানে। শুধুমাত্র হাস্যকৌতুক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেও বহু ছড়ারচিত হয়েছে। যেমন ঃ

মা তোমার জামাই এসেছে।
কনে বসেছে?
কান্‌চে বসেছে।
পাও ধুতি জল দিলাম
ধোলওতো না,
পাও মুছতি গামছা দিলাম,

মোছলোওতো না,
ঘরে নিয়ে খাতি দিলাম
খালোওতো না
মাচার তলায় বিছানা দিলাম
শোলোওতো না,
মুড়ো ঝাঁটার বাড়ি দিলাম
গ্যালোওতো না,
কচু বাগানে ঠ্যালা দিলাম
মলোওতো না।

কিংবা, চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে অলক ঝলক দিয়ে,
মণিমামা পান খেয়েছে শ্বাশুড়ি বাঁধা থুয়ে।
সেই পান খেয়ে মামা হাটে গিয়েছে,
হাটে ছিল দারোগা বাবু ধাক্কা মেরেছে।
সেই ধাক্কা খেয়ে মামা গাছে উঠেছে।
গাছে ছিল ঠোক পাখি ঠোক্ দিয়েছে।
সেই ঠোক্ খেয়ে মামা তলায় পড়েছে,
তলায় ছিল পাতিশিয়াল কামড় দিয়েছে।
সেই কামড় খেয়ে মামা বাড়ি এসেছে।
বাড়ি ছিল মামিমা ঠ্যাঙা মেরেছে।

উপরোক্ত ছড়াটিতে যথেষ্ট হাস্যরসের সৃষ্টিহয়েছে। একটি পান খাবার জন্য যে মণিমামা নিজেরশ্বাশুড়িকে বন্ধক রাখতেও দ্বিধাবোধ করেননি, ছড়া রচয়িতা শেষ পর্যন্ত সেই মণিমামার দুর্বুদ্ধিকেক্ষমা করতে পারেননি। গাল ভরে পানখেয়ে মণিমামা যেখানেই গেছেন সেখানেই তাঁকে অপদস্থ হতে হয়েছে। এই অপমানের চূড়ান্ত হয়েছে নিজেরই ঘরে--মামিমার ঠ্যাঙানিতে। কিন্তু এমন ছড়াও আছে যেখানে হাস্যরস প্রাধান্য লাভ করেছে বটে-কিন্তু যৌক্তিকতা বা সঙ্গতি খর্ব হয়েছে। যেমন ঃ

আদি গেছে আলুগাছে,
ঠ্যাং ধরিছে বোয়াল মাছে।
ও আদি বাড়ি আয়।
গাছবেড়েরা নিবার চায়।
ঘুগরি গড়ায়ে দিবার চায়।

আদি যে একটি মেয়ের নাম এটা বুঝতে কষ্ট হয়না। কিন্তু তার আলুগাছে ওঠার কথা শুনলেই হোঁচট খেতে হয়। আলু গাছের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন এটা কোনও জলজ বৃক্ষ নয়, স্রেফ ডাঙাতেইএর জন্ম এবং গুল্ম জাতীয় গাছ- মাটিতেই লতিয়ে থাকে। মেটেআলুর গাছ অনেক সময় অন্য গাছকে বেষ্টন করে উঠে যায়। গোল আলু, রাঙা আলু কিংবা মেটে আলু কোনও আলুর গাছই আরোহণ যোগ্য নয়। এহেন আলু গাছে শ্রীমতী আ াদি যখন আরোহণ করলই তখন বাঘ নয় শেয়াল নয় এমনকী স্থলচরকোনও প্রাণীই নয়, ঠ্যাং কামড়ে ধরল কিনা বোয়ালমাছ! নিয়তির পরিহাস আর কাকে বলে।

আবার সহজ নির্ভেজাল হাস্যকৌতুকের ছড়াও আছে। বাঙলাদেশে শ্যালিকা-জামাইবাবু সম্পর্ক একটি মিষ্টিমধুর সম্পর্ক। এদের মধ্যেযে ধরনের রসালাপ চলে তা অনেক ক্ষেত্রেই অনাবিল হাস্যরসের সৃষ্টিকরে। এইরকম একটি ছড়ার উল্লেখ করেই বর্তমান প্রসঙ্গের ইতি টানছি ঃ

দাদাবাবু কমলালেবু একা খেয়ো না
আমার দিদি ছেলেমানুষ কিচ্ছু বোঝে না।
আলতা দেবেন পায়,
এসেন্স দেবেন গায়।
দ্যাখেন তো দাদাবাবু কেমন দেখা যায়?

পেশাদার লেখককিংবা সংবাদপত্রের বেতনভূক সাংবাদিক না হয়েও সুদীর্ঘ চার দশক ধরে সাগর বিশ্বাস লিখেছেন অসংখ্য প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, কবিতা, ছড়া, আলোচনা, ভ্রমণকথা,সাক্ষাৎকার, রিপোর্ট ও রিপোর্টাজ। ছোট-বড় সব ধরণের পত্রিকাতেই লেখেন তিনি। নিজেও একটি লিট্‌ল ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেন -'একুশ শতাব্দী' (আমাদের ওয়েবসাইটেও রয়েছে)। সাহিত্যের কোন একক শাখা নয়, সাহিত্য, সামাজ,নৃতত্ব, রাজনীতি, সঙ্গীত, নাটক, যাত্রা বহুবিধ ক্ষেত্রেই তাঁর কলমের অবাধ প্রবেশাধিকার। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে -ছড়াছড়ি কলকাতা এবং সাত আকাশের তারা (কিশোর গল্প সংকলন) এবং সময়ের শব্দ।

বাংলার লোকসাহিত্যে ছড়ারস্থান অনবদ্য। গ্রাম্য জীবনের আনাচে-কানাচে, আচারে-অনুষ্ঠানে, প্রশংসা-শ্লেষ ছড়িয়ে আছে ছড়া। সাগর বিশ্বাসের এই রচনাটিরে উঠে এসেছে তারই এক চিত্তাকর্ষক বিবরণ। রচনাটি সংকলিত রয়েছে 'সময়ের শব্দ'গ্রন্থে।